সংবাদ
নাগরিক মঞ্চ

মাসিক পত্রিকা

জানুয়ারী - এপ্রিল, ২০১৪

এই সংখ্যায় থাকছে

শ্রমিক শ্রেণী এখন ৩

মৎস্যজীবীর বনাধিকার ৮

মঞ্চের উদ্যোগ ১২

সবুজ মঞ্চের দাবি সনদ ১৩

বিনামূল্যে ওষুধ ১৬

প্রতিশ্রুতিমতো নাগরিক মঞ্চ-এর ২৫ বছরে 'ফিরে দেখা' - ধারাবাহিকটি অনিবার্য কারণে ছাপা গেলনা। এছাড়া বর্তমান সংখ্যাটি ছাপতেও বেশ দেরী হয়ে গেল। আমরা তাই যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে সংখ্যাটি ছাপছি। পাঠক, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এই কারণে ক্ষমাপ্রার্থী।

নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত

মানুষের অধিকার -- চলমান সংগ্রাম

শতাধিক আইন ও মানবিক অধিকারের এক মূল্যবান সংগ্রহ

লেখক : নব দত্ত

মুখ্য পরিবেশক : দে বুক স্টোর্স (কলেজ স্ট্রিট)

মূল্য : ৩০০ টাকা

সম্পাদকীয়র বদলে —

১৫ জুন, ২০১৪ হুগলির নর্থব্রুক জুট মিল।

মিলের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার খুন হলেন শ্রমিকদের হাতে।

মিল কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের নোটিশ দিলেন। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সরকারের তরফে ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। প্রশ্ন উঠেছে ঘটনাস্থলে শ্রমিকদের কে বা কারা উপস্থিত ছিলেন? বহিরাগত কেউ ছিল কিনা। তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এসব নিয়ে গোয়েন্দা তদন্ত এখনও চলছে।

ইতিমধ্যে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। শ্রমিক লাইনে সন্ত্রস্ত মানুষজন। যে বা যারাই ম্যানেজমেন্টকে মারধোর, হত্যার ঘটনা ঘটাক না কেন — সেটা হতে পারে শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ফল বা অন্যকিছু — যাই হোক, এটা স্পষ্টভাবেই নিন্দাজনক ঘটনা। এই ধরনের হিংসা শ্রমিকদের অধিকার আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই আমরা উপযুক্ত তদন্তসাপেক্ষে এই ঘটনার জন্য দায়ী যারা তাদের শাস্তি চাই।

পশ্চিমবঙ্গের জুটমিলে এই ধরনের হিংসার ঘটনা বার বার ঘটছে কেন? তা কি কখনও তলিয়ে দেখা হয়েছে? ঘটনার পরে পরেই যে তদন্ত হয়েছে, অপরাধ - অপরাধীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কি? বাস্তবে পাটশিল্পের সমস্যা - শ্রমিকদের বঞ্চনা এসব জেনে বুঝেও সরকার বা মিল ম্যানেজমেন্ট কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি।

জুটমিলের গত কয়েক বছরের হিংসার ঘটনাগুলি যদি আমরা দেখি —

- ১৩ জানুয়ারি, ২০০১ বরানগর জুট মিল-এর লেবার অফিসার তিওয়ারির নিজস্ব রিভলভারের গুলিতে খুন হলেন একজন শ্রমিক, পরে শ্রমিকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তিওয়ারি এবং চীফ একজিকিউটিভ অফিসার গৌতম ঘোষকে খুন করল।
- ১৬ মে, ২০০২ ডালহৌসি জুটমিলের চীফ পার্সোনাল অফিসার খুন হলেন।
- ৮ অক্টোবর, ২০০২ রিষড়ার হেস্টিংস জুট মিলের লেবার অফিসার খুন হলেন।
- ১৫ মে, ২০০৮ টিটাগড় লুমটেক্স-এর পার্সোনাল ম্যানেজার খুন হলেন।
- ১৫ জুলাই, ২০১১ চন্দননগরে গোন্দলপাড়া জুটমিলের লেবার অফিসার খুন হলেন।
- ১৫ জুন, ২০১৪ হুগলির নর্থব্রুক জুট মিল -এর ঘটনা।

তেরো বছর আগে বরানগর জুট মিলের ঘটনার পর তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার তখনকার স্বরাষ্ট্রসচিব সৌরিন রায়কে দিয়ে একটি কমিশন গঠন করান। উল্লেখ্য যে সেই কমিশনের কাছে পাট ও পাটশিল্প এবং শ্রমিকদের বিষয় নিয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়। পরে তা

বই আকারে প্রকাশ হয়। আমরা সেই সময় বলেছিলাম, শিল্প শ্রমিকদের বিষয়টিকে সরকার শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখেছেন তাই তাঁরা স্বরাষ্ট্র সচিবকে দিয়ে কমিশন গঠন করেছেন। যদিও সেই কমিশনের সুপারিশে শ্রমিকদের বঞ্চনার বিষয়ে যে সব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, তা পরবর্তি সময়ে বামফ্রন্ট সরকার আরও দশ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলেও কিছুই করেনি। এর পরে পরেই সরকার একটি কমিটি তৈরি করেন, যাতে ছিলেন শ্রম সচিব, শ্রম কমিশনার, পি এফ কমিশনার এবং ই এস আই ডাইরেকটর, যারা জুট মিলগুলিতে গিয়ে শ্রমিকদের বক্তব্য শুনবেন এবং বকেয়া আদায়ে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সাত-আটটি মিল পরিদর্শনের পর সেই কমিটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কার স্বার্থে সেদিন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জানা নেই। সৌরিন রায় কমিটি জানিয়েছিল সমস্ত জুট মিলে ২০ হাজার শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি বকেয়া আছে । মোট বকেয়া অর্থ বলা হয়েছিল ৬০০ কোটি টাকা। আর আজ সমগ্র পাটশিল্পে গ্র্যাচুইটি না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার, বকেয়া ১৫০০ কোটি টাকা। ১৯৮০ সালে সমস্ত চট শিল্পে প্রভিডেন্ড ফান্ড এর বকেয়ার পরিমাণ ছিল মোট ৫ কোটি টাকা, যা আজ প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা। ই এস আই বকেয়া প্রায় ১২০ কোটি টাকা। এছাড়া আছে শ্রমিকদের আরও অন্যান্য পাওনা বাবদ বকেয়া। বিগত সরকার এ নিয়ে কিচ্ছুটি করেনি। কোনও তরফে এসব নিয়ে কথা বললে এবং শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দাবি দাওয়া নিয়ে কথাবার্তা বললে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ চলে যাবার এক মিথ্যা আতঙ্ক তৈরি করা হত। অথচ রাজ্যে অধিকাংশ জুট মিলে কোনও বিনিয়োগ হয়নি। ৭০ দশকের পর অধিকাংশ জুটমিলে কোনও আধুনিকিকরণ হয় নি। মান্ধাতার আমলের মেশিন, ভাঙ্গা লুম। জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলছে। এর পরেও আছে জুট মিলে বছর বছর ম্যানেজমেন্টের তরফে লোকসানের খতিয়ান — মিল বন্ধের হুমকি। মাঝে মাঝেই মিল বন্ধ। তাহলে করণীয় কী ? কর্তৃপক্ষের মতে,

ফর্মুলা ১ : উৎপাদন খরচ কমাও। মোট উৎপাদন ব্যয় শ্রমিকের মজুরির অংশ থেকে কমাও। ১৯৮৭-৮৮তে শ্রমিকের মজুরি বাবদ অংশ ছিল ৫১ শতাংশ, ১৯৯২-৯৩তে ৩৯ শতাংশ, ১৯৯৫-৯৬তে ২৭ শতাংশ, বর্তমানে যা ১৭ শতাংশ মাত্র।

ফর্মুলা ২ : মাথাপিছু কাজের বোঝা বাড়াও। ১ টন পাটজাত পণ্য উৎপাদনে ১৯৮০তে শ্রমিক লাগত ৫০-৫৫ জন, ১৯৯০তে ৪০-৩৭ জন, ২০০০ এ ৩০-২৫ জন, বর্তমানে ২০-১৫ জন।

বাড়তি কাজের বোঝা, সামাজিক সুরক্ষা বাবদ প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত, অনিশ্চয়তা, হতাশা এসবের ফলে কারখানার অভ্যন্তরে দুর্ঘটনা বাড়ছে, শ্রমিকদের অঙ্গহানি, মৃত্যু এসব তো লেগেই আছে। শ্রমিকদের আশ্রয় ট্রেড ইউনিয়ন। অথচ বলতে দ্বিধা নেই, বাংলায় জুট মিলের অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্থ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব গোটা শ্রমিক আন্দোলনের বারোটা বাজাচ্ছে। রাজ্যস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সব দেখেও ক্ষমতা ও অর্থের কাছে নতিস্বীকার করে চুপ থাকছেন। আমরা হতাশ হয়েছি বর্তমান সরকারের বক্তব্যে। শ্রমিকদের ক্ষোভ বিক্ষোভের আসল কারণ অনুসন্ধান না করে — তাদের বকেয়া, ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ে সরকারের পরিকল্পনা কি, কিভাবে তাদের বঞ্চনার নিরসন হবে, সেসবের মধ্যে না গিয়ে — জুট মিলে অশান্তি বন্ধে শাসকদলের রাজনৈতিক উদ্যোগের কথা বলছেন। তাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গে গোটা ২৪ জুট মিল বাদ দিলে প্রায় কোনও মিলেই মালিক বলে কিছু নেই। আছে কিছু লিজ নেওয়া ইজারাদার বা লাইসেন্সি ভাড়াটিয়া। যাদের শিল্পের সাথে সম্পর্ক বলতে কত কম খরচে কত দ্রুত লাভ করা যায় তা নিশ্চিত করা। এরাই দিনের পর দিন রাজ্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ শিল্পকর্তা ও বড় বিনিয়োগ জুটমিলে আসতে বাধা দিয়েছে। এদেরই অনীহার কারণে,১৯৮৪ তে নির্দ্দিষ্ট প্রায় ৩০০ কোটি টাকার জুট মডার্নাইজেশন ফান্ড খরচ হয় নি। এটা প্রায় সবাই জানেন, জুট মিলে সমান্তরাল এক কালো মাফিয়া অর্থনীতি চালু আছে। এরাই সরকারকে জুট সংক্রান্ত আর্থিক নীতি নির্ধারণে বাধা দিয়ে আসছে।

এখন জুট মিল চলে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের চটের ব্যাগের সরকারি অর্ডার-এর উপর। এখানে একটা হিসাব দিই। ২০১১-১২ ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এপ্রিল এই সময়ে চটের ব্যাগ (বিটুইল) সরকারি অর্ডার ছিল ৭.০৬ লাখ বেল, ২০১২-১৩ এই তিনমাসের অর্ডার ছিল ৭.০৯ লাখ বেল। ২০১৩-১৪ ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে অর্ডার ছিল ১.৬৫ লক্ষ বেল। এপ্রিল মাসে কোনও অর্ডার আসেনি। উল্টোদিকে এফ সি আই ২ লক্ষ বেল সিন্থেটিক ব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। প্রশ্ন হল রাজ্য সরকার কি জানতেন না? অধিকাংশ মিলে শ্রমিকের কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (প্রায় ১১ ঘন্টা) । নির্ধারিত মজুরিও অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। সারা সপ্তাহ কাজ দেওয়া হচ্ছে না। কেটে নিয়েও পি এফের টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে না। অবসরের পর গ্র্যাচুইটি পাচ্ছে না। যথেষ্ট ন্যায্য কারণে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে — রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? জেলায়, ব্লকে লেবার কমিশনাররা এই ঘটনা জানেন না? তাদের প্রায় সবারই এক উত্তর শুনতে হয়েছে - দেখছি, মিটিং ডাকব। মিটিং হলে বলছেন মালিকরা বলেছে আপনারা এ সব নিয়ে কোনও অশান্তি করলে মিল বন্ধ করে দেব। শিল্পে শান্তি বজায় রাখা মানে — শ্রমিকের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন। 'পরিবর্তন'এর আগে পরে সরকারের মনোভাবে, ভাবে ভাষায় কিছুই পাল্টায়নি। জুট মালিকরা রাজ্যে সরকার-নির্দিষ্ট আইন কানুন না মেনে 'জুলুমের রাজত্ব' কায়েম করেছে। সরকার তাদের আইন মানান — নয়ত দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখজনক আইন ভাঙ্গার ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তাতে শিল্প ও শ্রমিক কারোরই লাভ হবে না।

শ্রমিক শ্রেণী এখন

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

শ্রমিক, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, অবস্থান বদলে বদলে চলেছে। বদল হবারই কথা। প্রশ্ন বদলটা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে, না বিপক্ষে। কি ভাবে মাপলে ঠিকঠাক মাপা যায়, আমার জানা নেই। শ্রমিকের সংখ্যা, শ্রমিকদের আয়, শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধে এগুলো এক ধরণের মাপ হতে পারে। তা দিয়ে শ্রমিকদের আর্থনীতিক অবস্থা জানা গেলেও যেতে পারে। অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে। শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা, শ্রমিকদের দাবিপূরণ হওয়া, না- হওয়া, দাবির ধরণ, ট্রেডইউনিয়নের সংখ্যা, ট্রেডইউনিয়নে শ্রমিক সদস্যদের সংখ্যা, রাজনৈতিক দলগুলোয় সামনের সারিতে শ্রমিক সদস্য। এই সব মাপ দিয়ে বোঝা যেতে পারে শ্রমিকদের, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থা। হয়তো। হয়তো একধরণের বোঝা।

আরেক রকম ভাবে বোঝা যেতে পারে, শ্রমিক- পুঁজি সম্পর্ক, শ্রমিক- সরকার সম্পর্ক, আর পুঁজি- সরকার সম্পর্ক এই তিনটি সম্পর্ককে পাশাপাশি রেখে। কি ছিল, কি হচ্ছে, কি হয়েছে, কবে থেকে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এমন সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়ে বোঝা যেতে পারে শ্রমিকের, শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলা অবস্থান।

এর উত্তর সন্ধানে কয়েকটি মোটা দাগের উপাদান যোগান দেবার জন্য এই লেখাটি।

'শ্রমিক ' এই বর্গে অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন আনা হয়েছে। পুঁজি এবং সরকার/ রাষ্ট্র এই পরিবর্তন এনেছে, এনেই চলেছে। অনেক দিন ধরেই। ভাগাভাগির নাম গুলো আনলেই বোঝা যাবে। একই ধরণের কাজে স্থায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক। একই ধরণের কাজে কারখানার ভিতরে শ্রমিক, কারখানার বাইরে শ্রমিক। একই কারখানার ভিতরে স্থায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক। একই কারখানার ভিতরে একই কাজে স্থায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক। একই কারখানার ভিতরে একই ধরণের সবসময় কাজ দেওয়া স্থায়ী শ্রমিক, সব সময় কাজ না দিয়ে মাঝে মাঝে বসিয়ে রাখা স্থায়ী শ্রমিক। 'দক্ষ' শ্রমিক, 'অদক্ষ' শ্রমিক। দক্ষ শ্রমিক, 'শিক্ষণপ্রাপ্ত' শ্রমিক। 'সংগঠিত' শ্রমিক, 'অসংগঠিত' (?) শ্রমিক। পুরুষ শ্রমিক, নারী শ্রমিক। পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক, শিশু শ্রমিক। ভ্রাম্যমান শ্রমিক। দেশান্তরী শ্রমিক। 'দাস' শ্রমিক। উৎপাদন শিল্প শ্রমিক, পরিষেবা শ্রমিক,নির্মাণ শিল্প শ্রমিক। শ্রম আইন সংজ্ঞা মাফিক শ্রমিক, শ্রম আইন সংজ্ঞা বহির্ভূত শ্রমিক। চালু কারখানার শ্রমিক, বন্ধ কারখানার শ্রমিক। বন্ধ কারখানার বেকার ভাতা পাওয়া শ্রমিক, বেকার ভাতা না পাওয়া শ্রমিক। শ্রমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আসা শ্রমিক, আওতায় না আসা শ্রমিক। বড়ো কারখানার শ্রমিক, ছোট কারখানার শ্রমিক। ট্রেডইউনিয়নের আওতায় থাকা শ্রমিক, আওতায় না-থাকা শ্রমিক।

আমার অল্প জানায় এই কটি ভাগ বলতে পারলাম। যাঁরা এই বিষয়ে জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আরও বলতে পারবেন। পরের বিষয়, এই ভাগ করে দেওয়ার ফলে কি হল।

আবার বলি, এই বিষয়টা তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন যাঁরা শ্রমিকদের বিষয়ে কাজ করছেন, শ্রমিকদের সঙ্গে আছেন, সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন শ্রমিকরা নিজেরাই।

আমি যতটুকু বঝেছি ,বলি। শ্রমিকদের মধ্যে এই ভাগ নিয়ে এসে শ্রমিক ঐক্য নষ্ট করতে চাওয়া। শ্রমিকদের একটা অংশকে অন্য আর একটা অংশের বিপরীতে, বিরোধিতায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া। শ্রমিক আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ, বড়ো জোরদার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় সমস্যা তৈরি করা। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা বাধা পাওয়া। শ্রমিকদের টুকরো টুকরো করে, এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধতায় রেখে শ্রমিকদের 'শ্রমিক শ্রেণী' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াসে বাধা তৈরি করা। এটা রাজনীতিক দিক। বিষয়টার রাজনীতিক দিক।

শ্রমিক ভাগ ভাগ করে ফেলার আর্থনীতিক দিকও আছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে নিজেদের জোরে, নিজেদের সংগঠনের জোরে, রাজনীতিক জোরে শ্রমিকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে শ্রমিকদের জন্য সুযোগ, সুবিধা, প্রাপ্য আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। তখন রাষ্ট্র-ক্ষমতায় থাকা নানা রাজনীতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থের ক্ষমতা এমন ছিল না, যাতে শ্রমিকদের দাবি অস্বীকার করতে পারে। বরং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটা জোরের জায়গা ছিল। বামপন্থী রাজনীতির একটা জায়গা ছিল। এসব মিলিয়ে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছিল। আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনায়, আইনী ব্যবস্থাপনায়। তুলনামূলক ভাবে পুঁজির তখন অতটা জোর ছিল না, যাতে শ্রমিকদের প্রাপ্যকে অমান্য করতে পারে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক দল, সরকার নিজেকে 'শ্রমিক বিরোধী' দেখাতে তৈরি ছিল না। নিজের নাম দিয়েছে 'জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র'। শাসন ব্যবস্থার নাম দিয়েছে জননির্বাচন ভিত্তিক 'সংসদীয় গণতন্ত্র'। যেখানে নির্বাচক শ্রমিকরাও, যেখানে গণমানস ব্যক্তি পুঁজি, সংস্থা পুঁজির পক্ষে নয়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের 'অধিকার' পাওয়া। কারখানার ভিতরে অধিকার, কারখানার বাইরে অধিকার। সংগঠনের, মজুরির, কাজের সময়ের, মালিকের সঙ্গে দরকষাকষির, আন্দোলনের, বাসস্থানের, চিকিৎসার, স্থায়িত্বের, আইনের, নানা বিষয়ের অধিকার। এটা একদিকে। এটাকে ধরে রাখার জন্য অন্য দিকেও ব্যবস্থাপনা। শ্রমিকের তরফে ব্যবস্থাপনা।

ট্রেডইউনিয়ন, কারখানায় কারখানায় আলাদা আলাদা, একই শিল্পে যৌথ, সংযুক্ত শিল্পগুলিতে যৌথ শ্রমিক সংগঠন, রাজনীতিক দলগুলিতে শ্রমিক সদস্য, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব, রাজনীতিক দলগুলির শ্রমিক সংগঠন, সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির শ্রমিক সংগঠনদের সংঘবদ্ধতা, যৌথ আন্দোলন। শিল্প জুড়ে, দেশ জুড়ে। এসব অবস্থা ১৯৫০,১৯৬০,১৯৭০ দশকের। যা ১৯৭০ দশকে ছিল, তাই ১৯৮০ দশক এবং তারপরেও থাকবে, থেকে যাবেই এমনি এমনি, এমনটা ভাবা ঠিক নয়, ঠিক হয়নি।

সময় বদলায়, অবস্থা পালটে যায়, অবস্থান পরিবর্তিত হয়। এবং তা ক্রমশ শ্রমিকদের বিপরীতেই হয়েছে, রাষ্ট্রের এবং পুঁজির পক্ষেই হয়েছে।

কেন বদলেছে, কিভাবে বদলেছে, কারা বদলেছে, বদলে কি হয়েছে, সবটা আমি বলার যোগ্য নই। যতটুকু বুঝেছি, ততটুকুই বলতে পারি, তা খুবই সামান্য। তবুও শুরু করা যাক।

এখন এই লেখাতে ছোট ছোট করে বলবো। বিস্তারিত নয়।

এক।। পুঁজি, ব্যক্তি পুঁজি, সংস্থা পুঁজি, বিদেশি সংস্থা পুঁজি, ঋণ পুঁজি, আন্তর্জাতিক পুঁজি সংস্থা ক্রমশঃ তাদের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। পরিমাণে এবং বিস্তারে। আর্থনীতিক ক্ষমতায়, প্রযুক্তি ক্ষমতায়, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতায়, এবং রাজনীতিক ক্ষমতায়।

দুই ।। অতএব রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে, সরকার - তৈরি-করা - রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে পুঁজির ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, ক্ষমতা বেড়েছে। দলগুলিতে পুঁজির কাছ থেকে প্রাপ্তি, পুঁজির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, মানসিক সংযোগ, এবং অতএব ভাবনাগত যোগ তৈরি হয়েছে, বেড়েছে। পুঁজির প্রতিনিধিরা সরাসরি ভিতরে চলে এসেছে, আধিপত্য তৈরি করেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়েছে।

তিন।। এই প্রক্রিয়া থেকে বামপন্থী দলগুলি, যা শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসাবে প্রচারিত, তারাও বাদ যায়নি। তাঁরা পুঁজির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের পক্ষে এই অবস্থান থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া পুঁজির প্রকল্প।

চার।। যে সমস্ত বামপন্থী দল বিভিন্ন রাজ্যে প্রত্যক্ষভাবে সরকার বানিয়েছে এবং পরোক্ষে সরকার বানানোতে থেকেছে, তাদের বেলায় এই পরিবর্তন সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য তারা সংস্থা পুঁজির ওপর, বড়ো পুঁজির ওপর, তাদের শর্তেই, নির্ভর করেছে। ফলে পুঁজির স্বার্থ দেখেছে এবং অতএব বিপরীতে শ্রমিকের স্বার্থ দেখেনি। শ্রমিকদের দল, ট্রেডইউনিয়নের দল আর সরকারে-থাকা দল এবং পুঁজির স্বার্থ-দেখা দল এক হয়ে গেছে।

পাঁচ।। এর ফলে রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে, সরকারে থাকা, সরকারে যেতে চাওয়া রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতা, শ্রমিক শ্রেণী হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া কমতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত হতে থাকে। মধ্যবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণী তাদের রাজনীতিক- দলগত সমর্থন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

ছয়।। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ প্রয়োগে সমস্যা তৈরি হয়। শ্রমিক শ্রেণীর দল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত,কমিউনিস্ট পার্টির সরকার পরিচালিত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং পুঁজির মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুগোশ্লাভিয়া, পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত দেশগুলি, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া সব দেশে এই সমস্যা দেখা যায়। এই অবস্থা আমাদের দেশেও শ্রমিক শ্রেণীকে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনকে, শ্রমিক আন্দোলনকে, শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা তৈরি করে।

সাত।। সময়কাল ধরে, সর্বস্তরের, সর্বজনের স্বীকৃতিতে, যা প্রধানত ভোট দানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত, রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানের স্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। কোনও একটি বর্গের, কোন একটি অংশের বিরোধিতাকে রাষ্ট্র আর বিশেষ গণ্য করে না। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে আক্রমণের ভয় আর রাষ্ট্রের নেই। ফলে শ্রমিকদের নতুন অধিকার না দেওয়া,পুরনো অধিকার কেড়ে নেওয়া, কমিয়ে দেওয়া, অমান্য করা, এসবে রাষ্ট্রের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। রাষ্ট্রের কাছে শ্রমিকরা এখন কোনও শক্তিশালী রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক বর্গ নয়, অন্য অন্য অংশের মতো, তারা সাধারণ 'নাগরিক'। ফলে অন্য অন্য অংশের মতো, অংশের জন্য, অংশকে দেওয়ার মতো শ্রমিকদেরকে, শ্রমিকদের দেওয়ার জন্য ছোট ছোট, টুকরো টুকরো, অল্প অল্প, এক একটা বর্গের জন্য আলাদা আলাদা ভাতা, অনুদান,খয়রাতি প্রকল্প, যোজনা, আইন, নীতি। শ্রমিক শ্রেণীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য এমন আলাদা আলাদা দেওয়া। আবার এমন আলাদা আলাদা করে দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া, ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখা। শ্রমিক শ্রেণীর সার্বজনীন, সামগ্রিক 'অধিকার' কে মুছে দেওয়া। শ্রমিক শ্রেণীই শ্রমিক শ্রেণীর 'অধিকার' দাবি করে, পায়। আবার শ্রমিক শ্রেণীর 'অধিকার'-এর মধ্যে দিয়েই শ্রমিক শ্রেণী নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে, জানান দেয়। একটা ভেঙ্গে দিয়ে অন্যটাকে ভেঙ্গে দেওয়া।

আট।। এই সমস্ত কারণে, শ্রমিক-পুঁজি তুলনামূলক অবস্থানে, পুঁজির ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া, শ্রমিকদের ক্ষমতা কমে

যাওয়া। ফলে পুঁজির আক্রমণ। শ্রমিক আক্রান্ত। শ্রমিকদের টুকরো টুকরো করে ফেলা। শ্রমিকদের আইনি অধিকার অমান্য করা। শ্রমিকদের প্রাপ্য কমিয়ে দেওয়া, না-দেওয়া। শ্রমিকদের 'শ্রমিক' পরিচয় থেকে সরিয়ে দেওয়া। কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, কারখানা ভেঙ্গে দেওয়া, শ্রমিক বসতি ভেঙ্গে দেওয়া, অকেজো করে দেওয়া। শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। শ্রমিকদের কাজ আধুনিক প্রযুক্তি লাগিয়ে, আধুনিক যন্ত্র লাগিয়ে কমিয়ে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া, বন্ধ করে দেওয়া। শ্রমিক উচ্ছেদ।

নয়।। কারখানা, শ্রমিক-বসতি, শিল্পাঞ্চল এসবের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে স্থানীয় অ-শ্রমিকদের সম্পর্ক তৈরি হওয়া, সখ্যতা বানানো, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি হওয়া, বেড়ে চলা। শ্রমিক শ্রেণীর নিজের গড়ে ওঠা, নিজের অবস্থান অনুভব করা। বন্ধ কারখানা, বিধ্বস্ত শ্রমিক- বসতির মধ্যে দিয়ে এমন অবস্থান বদলে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। একটা অংশের গ্রামে চলে যাওয়া, অন্য অংশের অ-শ্রমিক হয়ে যাওয়া। অবস্থানগত পরিবর্তন।

দশ।। শ্রমিকদের এই অবস্থানগত পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় অন্য ক্ষেত্রে। সংবাদ মাধ্যমে এখন শ্রমিক বিষয়ক সংবাদ, আলোচনা, পর্যালোচনা, সমীক্ষা, মতামত, ছবি থাকে না। জানা হয় না। জানানো হয় না। শ্রমিকদের নিয়ে নাটক, সিনেমা, সাহিত্য, গান, ছবি প্রায় হয় না বললেই চলে। আমি আজকাল খুব একটা সিনেমা দেখি না। একটা ছবিতে দেখলাম বন্ধ কারখানার শ্রমিক। তাদের দেখানো হলো সারাদিন চায়ের দোকানে বসে থাকে আর গুলতানি করে। আগে অন্ততঃ সাহিত্যে শ্রমিক, কারখানা, শ্রমিক অঞ্চল থাকতো। শ্রমিকদের নিয়ে গান গাওয়া হতো। এখন আর নেই।

এগারো।। শ্রমিকদের পার্টি বলে পরিচিত বামপন্থী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই। শ্রমিকদের গুরুত্ব প্রায় শূন্য, শ্রমিকদের বিষয় প্রায় অনুপস্থিত। কমিউনিস্ট পার্টি এখন মধ্যবর্গের পার্টি। যে মধ্যবর্গ আজকে পুঁজিবাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদের ধারণার সঙ্গে, নীতির সঙ্গে, কাজের সঙ্গে, নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছে। ফলে তার অবস্থান শ্রমিক শ্রেণীর পাশে নয়, বিপরীতে। এখন কমিউনিস্ট পার্টি আর শ্রমিক শ্রেণীর জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নয়।

একটি যান্ত্রিক উদাহরণ দিতে পারি। দিন কয়েক আগে নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত বামপন্থী দলেদের সম্মিলিত একটি আবেদন (ইস্তেহার নয়) পেলাম। মোট ১৫ পাতার বই। সেই আবেদন বইতে 'শ্রমিক' শব্দটি আছে ২ বার, 'শ্রমিক শ্রেণী' শব্দটি আছে ১ বার আর 'শ্রমিক' বিষয়ে কথাটি আছে ৪ লাইন। আমাদের অঞ্চলে এই দলেদের যিনি নির্বাচন প্রার্থী, তার বিষয়ে একটি দুপাতার ছাপানো লেখাও বিলি করা হয়েছে। তার সম্বন্ধে লেখাও হয়েছে। তিনি শুরুতে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি 'আকৃষ্ট' হয়েছিলেন আর এখন মার্কসবাদী দর্শনে গভীর 'আস্থাশীল'। তার দুপাতার কাগজে, শ্রমিকদের নিয়ে মাত্র ১ লাইন। এবং শ্রমিকদের সম্পর্কে লাইনটি এই রকম 'বেতন বন্ধের আশঙ্কায় ভুগতে থাকা শ্রমিক'। এটি একটি সামান্য হয়তো অযথাযথ উদাহরণ। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান খানিকটা হলেও ধরা যায়।

বারো।। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে শ্রমিকের গুরুত্ব কমে গেছে, রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্ব নেই, শ্রমিকদের দাবি দাওয়া বড়ো থেকে ছোট হয়ে গেছে, যাচ্ছে। আমার দেখা সাম্প্রতিক উদাহরণ, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দাবির জোর, 'বন্ধ কারখানা খুলতে হবে' থেকে কমে গিয়ে 'বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বেকার ভাতা দিতে হবে' তে নেমে এসেছে। বহুদিন শ্রমিকদের কোনও বড়ো আন্দোলন, শিল্প জুড়ে, দেশ জুড়ে বড়ো আন্দোলন নেই। রেল ধর্মঘট, ডাক ধর্মঘট, টেলিকমিউনিকেশন শ্রমিক ধর্মঘট, কয়লা খনি ধর্মঘট, চা বাগান ধর্মঘট, পরিবহণ শ্রমিক ধর্মঘট নেই। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা কমছে বলে বড়ো ধর্মঘট হচ্ছে না। বড়ো ধর্মঘট হচ্ছে না বলে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থাকছে না। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থাকছে না বলে রাজনীতিক, সামাজিক ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান অনুভূত হচ্ছে না।

অনেকটা বলে ফেললাম। আমার যোগ্যতা যতটুকু কুলিয়েছে বলেছি। এরপর যাঁরা সত্যি সত্যি যোগ্য, যাঁরা জানেন তাঁরা বলবেন।

এবার এই বদলে চলা, বদলে যাওয়া অবস্থাটাকে আটকাতে, কিংবা বলা যায় পালটা বদলাতে কি করা যায়, তাই নিয়ে ভাবা, কথা বলা।

আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী কয়েকটা কথা বলব। মোটা দাগের কয়েকটা কথা। যা প্রধানতঃ শ্রমিকদেরকেই করতে হবে। যাঁরা এখনও শ্রমিকদের পাশে আছেন, তাঁরা পাশ থেকে সহায়তায় থাকবেন।

শ্রমিকদের চেষ্টা করতে হবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া, করে চলা, নানা শ্রমিক বর্গকে একটা সাধারণ, বড়ো 'শ্রমিক' বর্গের মধ্যে নিয়ে আসার। এটা রাজনীতিক কাজ। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, আলোচনা, আসা যাওয়া, থাকা, কথা বলা এর মধ্যে দিয়েই করতে হবে। একত্রিত

না হলে ঐক্যবদ্ধ না হলে সবার, সব শ্রমিক বর্গের ক্ষতি এটা বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। পুঁজিকে, পুঁজির শোষণকে সামনে রেখে, প্রতিপক্ষে রেখে, ভেঙ্গে ফেলার কায়দাকে, কারণকে বুঝিয়ে এই জড়ো করার কাজটা করতে হবে।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনটা কারখানা বন্ধ হবার পর প্রাপ্যের দাবিতে আটকে রাখার বাইরে ভাবতে হবে। কারখানা খোলার আন্দোলন, শ্রমিক সমবায়ে কারখানা খোলার বিষয়ে ভাবতে হবে। একবার নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে শ্রমিক সমবায়ে বন্ধ কারখানা খোলার প্রস্তাব বানানো হয়েছিল, সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, সরকার যে সব সমস্যার কথা বলেছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছিল। এমন কথা জানিয়ে আসা হয়েছিল সরকার চাইলে সব হয়। দরকার, রাজনীতিক সদিচ্ছা। এই দাবিটা আর এক বার তোলা যাক। একটা, দুটো, আলাদা আলাদা করে নয়। বন্ধ কারখানা নিয়ে একটা সামগ্রিক দাবি, শ্রমিক দাবি। সেই দাবিতে সামিল করা হোক বন্ধ কারখানা অঞ্চলের বাসিন্দাদের, যাঁরা শ্রমিকদের মতই ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা বন্ধ থাকায়। এটা শ্রমিকদের দাবি। শ্রমিক অঞ্চলের দাবি, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক অঞ্চলের আন্দোলন। সরকার যে যে 'সমস্যা'র কথা বলবে তার উত্তরে আন্দোলন 'সমাধান' জানিয়ে দেবে। যদি এমন হয় যে কারখানা ছিল, তার উৎপাদিত পণ্যের আর চাহিদা নেই, তাহলে এখন চাহিদা আছে এমন প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন হবে।

শ্রমিকদের অধিকারগুলো যে ভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অমান্য করা হচ্ছে , কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকরা তাঁদের আন্দোলন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, আবার সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। ৮ ঘন্টার কাজ, ন্যূনতম মজুরি, সপ্তাহিক ছুটি, শ্রমিক সংগঠনের অধিকার, কাজের স্থায়িত্ব, দর কষাকষির অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, চিকিৎসার অধিকার। যেভাবে তখন লড়াই করে পাওয়া গিয়েছিল, আবার সেভাবে লড়াই করে পাওয়া। তখন একরকম রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক অবস্থা ছিল, এখন অন্যরকম, এই যা। এই লড়াইতে যাঁরা এখনও এমন সব অধিকার পাচ্ছেন, তাঁরাও থাকবেন যাঁরা পাচ্ছেন না তাঁদের পক্ষে। এই কারণে থাকতে হবে তাঁরা কতদিন পারেন তা নিশ্চিত নয়। নিশ্চয়তা আসবে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই। অনেক কাল আগে নাগরিক মঞ্চে আমরা একটা 'শ্রমিক ব্যাঙ্কে'র কথা ভেবেছিলাম। চালু কারখানার শ্রমিকরা সেই ব্যাঙ্কে নিয়মিত টাকা জমা দেবেন বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য। এটা যতটা না আর্থিক প্রকল্প তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক ও রাজনীতিক প্রকল্প। এই প্রকল্পটা নিয়ে আবার ভাবা যেতে পারে। আন্দোলনের তহবিল।

আর একটা কথা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারলাম। 'আন্দোলন শ্রমিক'। শ্রমিক বলতে বোঝায় যাঁরা এখন কাজ করেন। কর্মরত শ্রমিক। বা যাঁরা বন্ধ কারখানার শ্রমিক। আইনত শ্রমিক। এর বাইরে আরেকদল শ্রমিকের কথা এসেছে। যাঁরা কারখানার শ্রমিক ছিলেন, কারখানা বন্ধ হওয়াতে এই কারখানার কাজ হারিয়েছেন, এবং অন্য কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু এই কারখানার আন্দোলনে চলে আসেন, যুক্ত হন, 'আন্দোলন শ্রমিক' হিসাবে। এই ধারণাটাকে একটু একটু করে বড়ো করা যায়। যাঁরা একদিন শ্রমিক ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন, তাঁরা 'আন্দোলন শ্রমিক'। কারখানা থেকে নানা কারণে কাজ হারানো শ্রমিক, 'আন্দোলন শ্রমিক'। শ্রমিক পরিবারের সদস্য, 'আন্দোলন শ্রমিক'। শ্রমিক বসতি, শ্রমিক এলাকায় থাকেন, কারখানার সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে আছেন। 'আন্দোলন শ্রমিক'। এমন ভাবে একটা বড়ো বাহিনী বানিয়ে নেওয়া যায়। যারা ভাবনায়, সহমর্মিতায়, কোনও না কোনও ভাবে যোগে একধরণের 'শ্রমিক', 'আন্দোলন শ্রমিক'। পুঁজি এবং রাষ্ট্র একদিক থেকে শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়ে আনছে। এমন ভাবে আরেক ভাবে 'শ্রমিকে'র সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া।

শ্রমিকদের এমন সব আন্দোলনে এতদিন নেতৃত্বে থাকা, প্রতিষ্ঠিত ট্রেডইউনিয়ন, বড়ো ট্রেডইউনিয়ন, সরকারে যাওয়া, সরকারে যেতে চাওয়া দলের শাখা ট্রেডইউনিয়নের বাইরে গিয়ে ভাবতে হবে। এই সব ট্রেডইউনিয়ন শ্রমিক আন্দোলন করে নিজেদের দলের, দলের সরকারদের ভাবনা অনুযায়ী। আর এখন আর কোন সরকারি দল নেই যারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে। যেমন যান্ত্রিক মাপকাঠিতে এই নির্বাচনে 'বামফ্রন্টের আবেদন'- এ 'শ্রমিক শ্রেণী' শব্দটা খুঁজেছিলাম, তেমনি 'পুঁজিবাদ', 'পুঁজিপতি শ্রেণী' কথা দুটি খুঁজতে গিয়ে একবারও দেখলাম না। এটা কোনও মাপ নয়, কেউ বলতে পারেন। তবুও যদি অবস্থাটা খানিকটা বোঝা যায়, তাই বলা। এই সব দলেরা সরকারে যেতে চায়, সরকারে থাকতে চায়। সরকারে থাকবে, আবার পুঁজিবাদের বিরোধিতা করবে, পুঁজির আক্রমণের বিরোধিতা করবে, শ্রমিক শ্রেণীর পাশে থাকবে, এমনটা অন্তত হয়নি। আগে করেনি কিন্তু পরে করবে এমনটি ভাবার কোনও সুযোগ নেই।

শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝে নিতে হবে, তার পাশে সরকার নেই, বড়ো দল নেই, বড়ো দলের বড়ো ট্রেডইউনিয়ন নেই। এই অবস্থায় এসে নিজেই নিজেকে তৈরি করা। এটা কোনও কঠিন কাজ নয়। বন্ধ কারখানা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাউড়িয়া কটন মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। শ্রমিকরা একজন একজন করে আমাকে বোঝালেন কারখানায় নতুন প্রযুক্তি আনা, নতুন মেশিন বসানোর সঙ্গে শ্রমিকদের কাজ কমে যাওয়ার সম্পর্ক, শ্রমিকের দক্ষতার সঙ্গে শ্রমিকের জোরের সম্বন্ধ, উৎপাদক পুঁজির প্রথম প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের পার্থক্য, উৎপাদক

পুঁজির সঙ্গে বাণিজ্য পুঁজি ও ফাটকা পুঁজির পার্থক্য, কারখানার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া, চাহিদা কমে যাওয়ার সঙ্গে উৎপাদন কমে যাওয়া, উৎপাদন কমে যাওয়ার সঙ্গে শ্রম নিয়োগ কমে যাওয়ার চিহ্ন, যা শ্রমিকরা বুঝতে পারেন, কিন্তু শ্রমিকদের সুযোগ নেই একই যন্ত্রে সামান্য বদল এনে সহযোগী পণ্য কিংবা নতুন চাহিদার পণ্য বানাবার জন্য প্রয়োজনীয় বদল আনা, আনার প্রস্তাব দেওয়া, প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার, কারখানার বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া। শ্রমিকরা জানেন কোথায় কোথায় কি ভাবে ট্রেডইউনিয়ন মালিকের সাথে সমঝোতা করে, সমঝোতায় ট্রেডইউনিয়নের, ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের কি লাভ। শ্রমিকরা আমায় কারখানাটির অর্থনীতি, অর্থনীতিতে ক্রম পরিবর্তন, পরিবর্তনের জরুরী চিহ্ন বোঝালেন, যে চিহ্ন দেখে অনেক আগে থেকেই শ্রমিকরা বোঝেন মালিক কারখানা বন্ধ করে দিতে চলেছে। কিন্তু তাদের জ্ঞান, বোধ, চেতনা কোনও কাজেই লাগেনি কারখানা বাঁচাতে। ট্রেডইউনিয়ন কাজে লাগাতে চায়নি। 'শ্রমিক শ্রেণী' হিসাবে নিজেদের রাজনীতির সামনে নিয়ে আসার উপাদানের অভাব নেই।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও শ্রমিক বসতি, শ্রমিক এলাকা এখনও রয়ে গেছে। সেখানে সুযোগ রয়েছে, উপাদান রয়েছে নিজেদেরকে তৈরি করার।

এ তো গেল বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের কথা। চালু কারখানার শ্রমিকরাও একই রকম শিক্ষিত। সে অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে।

অন্য একটা কথা। আক্রান্ত হতে হতে, কারখানা বন্ধ হয়ে কাজহারা হতে হতে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে হতে, অধিকার হারাতে হারাতে শ্রমিকরা তাঁদের মর্যাদা, সম্মান, জোর-এর অনুভব, বোধ, প্রকাশ হারিয়ে ফেলছেন। একদিন যে অহংকারে, বলতেন 'আমরা খাটি তাই অন্যরা খায়, দেশ চলে', সেই অহংকার হারিয়ে ফেলছেন। একদিন যে স্পর্ধায় তাঁরা ঘোষণা করতেন, আমরা লড়াই করেছিলাম তাই অন্যরা ৮ ঘন্টা কাজ করে, আমরা আন্দোলন করেছিলাম তাই অন্যরা সপ্তাহ শেষে ছুটি পায়, আমরা সংগ্রাম করেছিলাম, তাই অন্যরা পেনশন পায়।

শ্রমিক শ্রেণীকে এই অহংকারে, স্পর্ধায়, মর্যাদায় ফিরে আসতে হবে। ফিরে আসতেই হবে।

পরিবেশ কর্মী বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত স্মরণে

১৯৮৬ সাল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল 'সুন্দরবন ফার্টিলাইজার' কোম্পানি লক্ষীকান্তপুরে সার কারখানা তৈরি করবে। আমরা যারা কলকাতায় বসে বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত করছি তারা চিন্তিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা লক্ষীকান্তপুরে সার কারখানা তৈরি হলে সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে সুন্দরবনের পরিবেশ, জীবন ও জীবিকা। কলকাতা থেকে সেই সময় প্রকাশিত হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা, 'উৎসমানুষ' পত্রিকা। সেই সব পত্রিকার পাতায় লক্ষীকান্তপুরে সার কারখানা নিয়ে নিবন্ধ লেখা হচ্ছে।

একদিন 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা দপ্তরে, ওই পত্রিকায় প্রকাশিত সুন্দরবনে প্রস্তাবিত সার কারখানার সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণের একটা প্রবন্ধ হাতে নিয়ে হাজির বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লক্ষীকান্তপুরের সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা। অকৃতদার। থাকেন মাটির দোতলা বড়িতে, তাঁর মাকে নিয়ে। তাঁর নিজের ঘর ভর্তি থাকতো অজস্র বই-পত্র পত্রিকা। চাকরি করতেন ডাক ও তার বিভাগে। আর তাঁর আসল সংসার বা পরিবার ছিল বিস্তীর্ণ লক্ষীকান্তপুরের অগণিত সাধারণ মানুষকে নিয়ে। সেই থেকে শুরু এক সাথে দীর্ঘ পথ চলার, দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের।

বিশুদ্ধদার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় লক্ষীকান্তপুরে গড়ে উঠল এক আশ্চর্য পরিবেশ আন্দোলন। সংকীর্ণ রাজনীতিক বা গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য ও গণ্ডী পেরিয়ে, এ আন্দোলন এক সত্যিকারের গণ-আন্দোলন, জন-জাগরন। গড়ে উঠল 'মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'। সাধারণ মানুষকে ধৈর্য ধরে সার কারখানার বিপদের কথা বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন বিশুদ্ধদা, সঙ্গে রইল তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী সাথী কর্মীদল। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে তৈরি হল পথ নাটকের দল, কেউ লিখলেন কবিতা। মানুষ সাড়া দিল নানানভাবে। আশ্চর্য, কোথাও কোনো ক্রোধ হুঙ্কার নেই। আছে সুসংহত ঐক্য, সহযোগিতার বাতাবরণ। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও জনভিত্তি এতটাই সংগঠিত হল যে গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রস্তাবিত সার কারখানার জন্য তাদের জমি বেচতে চাইলেন না। যদিও সার খারখানা তাদের অনেক বেশি টাকা দেবে বলে লোভ দেখিয়ে ছিল। নিরুপায় 'সুন্দরবন ফার্টিলাইজার' কোম্পানি প্রস্তাবিত সার কারখানার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে লক্ষীকান্তপুর ছেড়ে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ আন্দোলনে বিশুদ্ধদার নেতৃত্বে 'মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি' একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

গত ৩১ মে, ২০১৪ দিন সাতেকের অসুস্থতায় ৭১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত। আমাদের সবাইয়ের বিশুদ্ধদা। তাঁর প্রয়াণকে স্মরণ করতে গত ২১ জুন, ২০১৪ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার তরফে স্টুডেন্টস্ হলে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

সুন্দরবনের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা বনাধিকার থেকে আজও বঞ্চিত

শশাঙ্ক দেব

সুন্দরবন পৃথিবীর সবথেকে সমৃদ্ধ এবং একমাত্র বাঘ অধ্যুষিত বাদাবনের অঞ্চল। এর মোটামুটি ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে আর ৪০ শতাংশ ভারতে।

বর্তমানে ভারতীয় সুন্দরবনের প্রশাসনিক ও সংরক্ষণগত অবস্থাটা এইরকম -

- সুন্দরবনের গোটা এলাকা (৯৬৩০ বর্গ কিমি) **সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল সংরক্ষণ** হিসাবে ঘোষিত।
- সুন্দরবনের জনবসতি এলাকা ৪৪৯৩.৬ বর্গ কিমি।
- মোট দ্বীপ - ১০২, তার মধ্যে জনবসতি আছে - ৫৪টিতে
- মোট ব্লকের সংখ্যা ১৯ (উত্তর ২৪ পরগণা - ৬, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ১৩)।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪২৬৫ বর্গ কিমি।

নোনা জল ও মাটিতে চাষের অবস্থা ভাল না হওয়ায় এই অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে যান। মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, শুকনো কাঠ ও ঝিনুক সংগ্রহ — এই হল সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ভর মানুষের জীবিকা অর্জনের চারটি প্রধান উপায়। হাজার হাজার মৎস্যজীবী বংশপরম্পরায় সুন্দরবনের নদী, নালা, খাঁড়ি ও জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তাঁরা কারও মুখাপেক্ষী নন। নিজেদের সাহস, শক্তি ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে বাঘ, কুমির, হাঙ্গর, বিষধর সাপ, জলদস্যু, সামুদ্রিক ঝড় উপেক্ষা করে, অশেষ পরিশ্রমে তারা জঙ্গল থেকে জীবিকার রসদ সংগ্রহ করেন।

সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকার ৪২৬৫ বর্গ কিমি-এর মধ্যে ২৫৮৫ বর্গ কিমি ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণে, বাকি ১৬৮০ বর্গ কিমি সাধারণ সংরক্ষিত জঙ্গল এবং বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়ারির মধ্যে। মৎস্যজীবী এবং মধু সংগ্রাহকরা ব্রিটিশ রাজের আমল থেকে এই অঞ্চলে জঙ্গল করত অর্থাৎ মাছ ধরত এবং কাঠ, মধু ও ঝিনুক সংগ্রহ করত। সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশ ধাপে ধাপে সংরক্ষিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই ধরনের কাজে বাধা পড়ে নি, শুধু কারা জঙ্গলে ঢুকছে তা নথিভূক্ত করার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। নৌকা রেজিস্ট্রি করা, পারমিট দেওয়া এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার অনুমতি ছিল। ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ন্ত্রণের প্রথম পরিকল্পনায় বলা হল এই সব কাজ জঙ্গল - নির্ভর মানুষের সাধারণ জীবনের অঙ্গাঙ্গী। অথচ কোনওরকম মূল্যায়ন ছাড়াই এবং চিরাচরিত ভাবে জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল এই মানুষদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ ছাড়াই ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ১৩৩০ বর্গ কিমি এলাকাকে বেআইনিভাবে 'কোর' এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হল। সবরকম প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল সম্পূর্ণ একতরফাভাবে। বাকি যে ১২৫৫ বর্গ কিমি 'বাফার' এলাকা পড়ে রইল, সেখানে প্রথম দিকে মাছ ধরার এবং মধু সংগ্রহের অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জঙ্গল করার সুযোগ ছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালে সজনেখালি পাখি স্যাংচুয়ারি ঘোষিত হবার পর 'কোর' এলাকার পরিমাণ হল ১৬৯৩ বর্গ কিমি। বাফার এলাকার পরিমাণ দাঁড়াল ৮৯২ বর্গ কিমি। ১৯৮০-র দশক থেকে সেই কমে যাওয়া বাফার এলাকাতেও অবাধে জঙ্গল করা বন্ধ হল। ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় কেবলমাত্র ৯২৩-টি নৌকাকে অনুমতি (বি এল সি — বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) দেওয়া হল জঙ্গলে যাবার। কিভাবে সংখ্যাটি ৯২৩ হল, কেন ৫০০ বা ১০০০ হল না, কোনও মূল্যায়ন হয়েছিল কিনা তার কোনও হদিশ নেই। বন দপ্তরের দায়িত্বশীল আধিকারিকরাও তা বলতে পারেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নতুন কোনও বি এল সি দেওয়া হয় নি। মজার বিষয় — বি এল সি যেসব নির্দিষ্ট নৌকার নামে দেওয়া হয়েছিল সেগুলির কোনওটিরই এখন আর অস্তিত্ব নেই। তবে যাদের নামে দেওয়া হয়েছিল তাদের নামে এখনও সেগুলি চালু আছে এবং সেগুলিই হল বর্তমানে জঙ্গল করার একমাত্র বৈধ ছাড়পত্র। এই ৯২৩-এর মধ্যে বেশ কিছু নৌকার কোনও হদিশ নেই। বর্তমানে ৯২৩-এর মধ্যে মাত্র ৭০০ বি এল সি চালু আছে। তাও এর মালিকরা অনেকেই (অন্ততঃ ৩০০ জন) প্রত্যক্ষ মৎস্যজীবী নন — তাঁরা ভাড়া খাটান এই বি এল সি-গুলি। প্রতি বছর ৩০০০০ থেকে ৩৫০০০ টাকা ভাড়ায় খাটে এই সব বি এল সি।

এবারে হিসাব করা যাক কত জন অনুমতি নিয়ে জঙ্গলে যেতে পারেন। শুধু নৌকার বি এল সি থাকলে হল না, প্রত্যেক যাত্রার আগে যে মৎস্যজীবীরা ঐ নৌকায় যাবেন তাঁদের নামও নথিভূক্ত করে অনুমতি নিতে হয়। এক একটি নৌকায় চার পাঁচজন থাকলে ৭০০ নৌকায় খুব বেশি হলে ৩৫০০ জন মানুষের সুযোগ হল এই ৮৯২ বর্গ কিমি বাফার এলাকার জলে মাছ ধরার। মৎস্যজীবীর সংখ্যা যেখানে সরকারি মতে ১৫০০০ (বেসরকারি মতে ৪০০০০ — তাও যাদের প্রধান জীবিকা মাছ

ধরা তাদের কথা বলা হচ্ছে — তা না হলে সুন্দরবনের বহু মহিলা - পুরুষ গ্রামের কাছাকাছি নদী, খাঁড়িতে মাছ ধরেই থাকেন)। সেখানে বাধ্য হয়েই ব্যাপক সংখ্যক মৎস্যজীবী বেআইনি জীবন জীবিকা যাপন করতে বাধ্য হলেন। যা তাঁদের ছিল স্বাভাবিক জীবন জীবিকার অধিকার, তা সরকারি সিদ্ধান্তের এক কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে গেল। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই 'কোর' এলাকার পরিমাণ আরও ৩৭০ বর্গ কিমি বাড়ানো হল। ২০০৬ সালের সংশোধিত **বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন** অনুযায়ী জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সম্মতি না নিয়ে টাইগার রিজার্ভ সংক্রান্ত কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। তা সত্ত্বেও এরকম নির্দেশ একতরফাভাবে জারি হল। ফলে কোর এলাকার পরিমাণ বেড়ে হল ১৭০০ বর্গ কিমি এবং বাফার এলাকার পরিমাণ ৮৯২ থেকে কমে হল ৫৩২ বর্গ কিমি। এর পরেও কোর এলাকা বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে।

শুধু এলাকার পরিমাণ দিয়ে অবশ্য সমস্যার গুরুত্ব বোঝানো যাবে না। মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, যে সমস্ত এলাকায় মাছ ভাল পাওয়া যায় সেই সমস্ত এলাকাকে কোর এলাকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কোন যুক্তিতে এমন করা হল এর কোনো ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন বা দলিল বন দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। পূর্ব প্রান্তের এমন কিছু এলাকায় মাছ ধরার সুযোগ দেওয়া হল যেখানে মৎস্যজীবীদের অধিকাংশের হাল দাঁড়ের নৌকা নিয়ে যাওয়া দুরূহ। অথচ সংরক্ষিত এলাকায় যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া নিষিদ্ধ। এক দিকে এই সিদ্ধান্ত ভাল কেননা তা পরিবেশ এবং বিশেষ ভাবে জল ভাল রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু পরিবেশ অনুযোগী হাল দাঁড়ের নৌকা সুন্দরবনের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বহু দূরে নিয়ে যাওয়া যে কতটা সমস্যার, তা বন দপ্তর বুঝতে রাজি নয়। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে অধিকাংশ চলাচলের রাস্তা অর্থাৎ নদীগুলিকে (নবাঁকী, আড়াভাঙ্গী, বিদ্যানদী, নেতি ধোপানী) কোর এলাকায় ফেলা হল। ফলে মৎস্যজীবীদের গ্রাম থেকে হাল দাঁড়ের নৌকা নিয়ে পূর্বপ্রান্তে যেতে হলে দক্ষিণ প্রান্তের মোহনা এলাকা দিয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক হল। সেখানে একদিকে সমুদ্রের নিকটবর্তী উত্তাল তরঙ্গের ভয়, ঝড় - ঝঞ্ঝা থেকে নিরাপত্তাহীনতার ভয়, বাংলাদেশের ডাকাতের ভয়, বি এস এফ রক্ষীদের ভয় — সবকিছুই মৎস্যজীবীদের সঙ্গী হল।

ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাইরে পশ্চিমের সংরক্ষিত বনাঞ্চলেও বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। সেখানেও পরিমিট চালু আছে। কিন্তু কিভাবে কত পারমিট দেওয়া হবে তা বন দপ্তরের মর্জি মাফিক। কোনও কোনও মরশুমে পারমিট বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক সময় নির্দিষ্ট পারমিট ছাড়া লগ বুক চালু করে মাছ ধরতে দেওয়া হয়, কিন্তু তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বি এল সি এবং পারমিট যাঁদের নেই, তাঁরা তো বটেই, যাঁরা সেগুলি নিয়েও বাফার এলাকায় মাছ ধরতে যান তাঁরাও বন দফতরের চরম অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হন। যখন তখন কোর এলাকায় ঢুকে পড়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই অত্যাচার প্রতিদিন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ওপর চলছে — মাছ-কাঁকড়া কেড়ে নেওয়া অথবা ফেলে দেওয়া, জাল নৌকা আটকে রাখা, পারমিট আটকে রাখা, সেগুলি ফেরৎ নিতে গেলে হয়রানি করা, অশ্রাব্য গালিগালাজ, মারধোর এসব ঘটেই চলেছে। বহু ক্ষেত্রে বনরক্ষীদের তাড়া খেয়ে মৎস্যজীবীরা খাঁড়িতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হন আর সেখানেই বাঘের শিকার হন। এছাড়া বছর বছর মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে বি এল সি নবীকরণ ও পারমিটের ফি মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়ানো হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের জঙ্গল নির্ভর আর একটি জীবিকা হল মধু সংগ্রহ। বছরের নির্দ্দিষ্ট একটি সময় মাছ ধরার ওপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মাছের প্রজননের জন্য বা কিছুটা বেড়ে ওঠার জন্য অর্থাৎ মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য। দায়িত্বশীল মৎস্যজীবীরা তা মেনে চলেন। এই সময় কোনও বি এল সি নবীকরণ বা পারমিট দেওয়া হয় না। যদিও পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে তাদের এই সময় উপার্জন বন্ধ হবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য, কিন্তু তার কোনও ব্যবস্থা নেই। বছরের এই সময়, সাধারণ ভাবে এপ্রিল মাসে, মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের জন্য কিছু মৎস্যজীবীকে মধু সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও আছে অত্যন্ত অন্যায় এবং বৈষম্য। যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা নিয়ে, পারমিট ফি জমা দিয়ে, অসম্ভব পরিশ্রম করে মৎস্যজীবীরা যে মধু সংগ্রহ করেন তা সবটাই বন দফতর (ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)-কে বিক্রি করতে বাধ্য হন এই মধু সংগ্রহকারীরা। বিনিময়ে পান নামমাত্র দাম। বাজারে যেখানে মধু বিক্রি হয় ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম, সেখানে দু'বছর আগেও তাঁরা পেতেন ৪২ টাকা। অনেক প্রতিবাদ -ডেপুটেশন-এর পর তা বেড়ে ৭৫ টাকা এবং সম্প্রতি ১০০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু বন দফতর যখন পারমিটের টাকা নিচ্ছে তখন কেন বাধ্যতামূলক ভাবে তাদেরই সম্পূর্ণ মধু দিতে হবে, কেন তা খোলা বাজারে বিক্রি করা যাবে না তার কোনও উত্তর নেই।

অন্যদিকে সুন্দরবন রক্ষার নামে চলছে চরম ভন্ডামি। জলের মারাত্মক দূষণ বন্ধ করায় কর্তৃপক্ষের কোনও উদ্যোগ নেই। মৎস্যজীবীদের জন্য হালদাঁড়ের নৌকা বাধ্যতামূলক হলেও হাজার হাজার যন্ত্রচালিত ট্যুরিস্ট লঞ্চ সেখানে যাচ্ছে। প্লাস্টিক ব্যবহারে লোক দেখানো নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অসংখ্য প্লাস্টিক গ্লাস, কাপ, থার্মোকলের প্লেট নদী ও জঙ্গল ভরিয়ে ফেলছে। পশু পাখির শান্তির তোয়াক্কা না করে মাইকের যথেচ্ছ

ব্যবহার চলছে। যেখানে - সেখানে উপকূল বিধিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নদীর চরে হোটেল রিসর্ট গজিয়ে উঠছে। সেগুলি দেখতে না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তবুও প্রশাসন বিশেষভাবে বন দপ্তর অন্ধ এবং নীরব। বাংলাদেশ থেকে আসা কাঠচোর ও চোরাশিকারিরা যখন সুন্দরবনকে শেষ করে দিচ্ছে তখন বনদপ্তরের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মৎস্যজীবীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা।

২০০৬ সালে সংসদে **জন জাতি ও অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসী (বনাধিকার স্বীকৃতি) আইন** বা দ্য সিডিউলড ট্রাইব্স অ্যাণ্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডোয়েলার্স (রেকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট পাশ হয়। ২০০৮-এর জানুয়ারি মাস থেকে তা প্রয়োগ করার কথা ঘোষিত হয়। আইনের মুখবন্ধে বলা হয় বনবাসীদের ওপর এতাবৎকাল ঘটে আসা অন্যায়ের প্রতিকারে এই আইন। এই আইনে বনাঞ্চলের গ্রামবাসীদের নিয়ে গঠিত গ্রামসভাকে জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য সুস্থায়ীভাবে জঙ্গল ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হল। গ্রামসভার নির্বাচিত বন অধিকার রক্ষা কমিটির দায়িত্ব হল এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করার। বলা হল ব্যক্তি ও পারিবারিক এবং গোষ্ঠীর অধিকারের দাবিগুলিকে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করার। কেন্দ্রীয় স্তরে জন জাতি বিষয়ক মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স - এম ও টি এ) এবং পশ্চিমবঙ্গে পশ্চাৎপদ শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট - বি সি ডব্লিউ) এই আইন কার্যকর করার দায়িত্বে থাকল।

এই আইনে **'বনবাসী'** -র সংজ্ঞায় বলা হল *বনবাসী জনজাতির অর্থ হল জনজাতির যে সদস্যরা বা গোষ্ঠী প্রাথমিক ভাবে জঙ্গলে বাস করেন এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনে জঙ্গল বা জঙ্গলের জমির ওপর নির্ভরশীল বা জনজাতিভুক্ত যাযাবর গোষ্ঠী [২(সি)] এবং অন্য চিরাচরিত বনবাসী-র অর্থ হল যে সমস্ত গোষ্ঠী ১৩ ডিসেম্বর ২০০৫-এর আগে পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে প্রাথমিক ভাবে জঙ্গলে বসবাস করেন এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনের জন্য জঙ্গল বা জঙ্গলের জমির ওপর নির্ভরশীল [২(ও)]*। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী জঙ্গলনির্ভর মানুষের মধ্যে বেশ কিছু আদিবাসী বা জনজাতি গোষ্ঠীর সদস্য থাকলেও অধিকাংশই তপশীল বা অনুসূচিত জাতিভুক্ত। আইনটি যেহেতু জনজাতি এবং অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসীদের জন্য, তাই ২(ও) ধারা অনুযায়ী সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদেরও এই আইন অনুযায়ী সুযোগ পাওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভ্রান্তি তৈরি হল তাঁরা 'বনবাসী' কিনা তা নিয়ে। একথা ঠিক — বৃহত্তর সুন্দরবনের জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামগুলিতে অধিকাংশ মৎস্যজীবীর (কৃষিজীবী ও অন্যান্য পেশার মানুষের সঙ্গে) বাস হলেও সরাসরি কোর বা বাফার এলাকায় কোনও গ্রাম নেই বা থাকলেও তা নগণ্য। ফলে তাঁরা জীবন ধারণের জন্য জঙ্গলের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হলেও জঙ্গলে বাস করেন না।

এই বিভ্রান্তি নিরসন হল জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের ৯ জুন ২০০৮-এর একটি নির্দেশনামায় [নং ১৭০১৪/০২/২০০৭ - পি সি অ্যাণ্ড ভি (ভল্যুম ৭)]। এই নির্দেশনামায় স্পষ্ট বলা হল ''বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে মন্ত্রকের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে যাঁরা জঙ্গলের ভিতরে বসবাস করেন না কিন্তু জঙ্গল বা জঙ্গলের জমির উপর নির্ভরশীল তাঁরা এই দুটি ধারা অনুযায়ী **বনবাসী** হিসাবে গণ্য হবেন কিনা। বিষয়টি আইন ও বিচার মন্ত্রকের (মিনিস্ট্রি অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস)-র সঙ্গে পর্যালোচনা করে ঠিক হয়েছে — যে সমস্ত জনজাতি বা অন্যান্য বনবাসী যাঁরা আবশ্যিকভাবে জঙ্গলে বাস করেন না কিন্তু জীবনধারণের জন্য জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল তাঁরাও **জনজাতি বনবাসী** বা **অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসী গোষ্ঠী** হিসাবে স্বীকৃত হবেন।

এই ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীভিত্তিক বনাধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি নাকচ হয়ে আছে। ২০০৮ সালে অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর সব জেলা শাসকদের একটি সাধারণ সার্কুলারে বনাধিকার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলেছিল যা মে মাসে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের জন্য পিছিয়ে যায়। তারপর যে সমস্ত জেলাগুলিতে বনাধিকার আইন প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, লক্ষ্যণীয়ভাবে তাতে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার নাম নেই। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট ঘোষণায় জানা যাচ্ছে এই রাজ্যে বনাধিকার আইন লাগু করার জন্য তাঁরা পশ্চিবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে ১১টি জেলাকে বেছে নিয়েছেন — জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, কুচবিহার, বীরভূম, হুগলি, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া। বহু আবেদন, নিবেদন, ডেপুটেশন ইত্যাদির পরেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বক্তব্য, সুন্দরবনে অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণায় এই আইন প্রযোজ্য নয়!

মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি বিশেষত সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি অসংখ্য বার মন্ত্রী ও জেলাশাসকের কাছে দাবি পেশ করেছে কিন্তু এই আইন কার্যকর করার কোনও প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। পথসভা, জনসভা, ডেপুটেশন, মিছিল, নাগরিক সমাবেশ, বোট ক্যাম্পেন, ইত্যাদি করেও সরকারি দফতরের ঘুম ভাঙ্গানো যায়নি। আর একটি সংগঠন 'সুন্দরবন জন শ্রমজীবী মঞ্চ' বোট ক্যাম্পেন এবং গ্রাম সভা গঠনের উদ্যোগ নিলেও, বনাধিকার আইন কার্যকর করার কোনও উদ্যোগ সরকারি তরফে দেখা যায় নি। আসলে সুন্দরবনে চলছে বন দফতরের রাজত্ব। বনাধিকার আইন অনুযায়ী এই দফতরের অধিকাংশ কার্যকলাপ বেআইনি। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের চরম উদ্যোগহীনতায় এই

আইন লঙ্ঘন করে বন দফতরই সর্বময় কর্তৃত্ব কায়েম করেছে।

একথা ঠিক যে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে, যেমন—

১) এসব ক্ষেত্রে গ্রামসভা কিভাবে গঠিত হবে তা কেন্দ্রীয় আইন এবং রুলে স্পষ্ট নয়। একদিকে গ্রামগুলি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত নয়, অন্যদিকে জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামগুলিতে মৎস্যজীবী ছাড়াও অন্যান্য পেশার মানুষ বাস করেন। আনুপাতিক হারে তাঁদের সংখ্যাই বেশি। ফলে গ্রামসভাগুলি কাদের নিয়ে তৈরি হবে তা স্পষ্ট নয়। যাঁরা জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র সেই তাঁদের নিয়েই এই গ্রামসভাগুলি গড়ে উঠলে বনাধিকার আইনের প্রয়োগ সম্ভব। রাজ্য স্তরে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।

২) গ্রামসভা গুলিতে মৎস্যজীবীরা দাবি পেশ করবেন কিভাবে। জঙ্গলের যে সম্পদের ওপর তাঁরা নির্ভরশীল, অর্থাৎ মাছ, মধু, ইত্যাদি — তা গ্রামের মধ্যে নেই। ব্যক্তি বা পারিবারিক অধিকারের দাবি এখানে প্রাসঙ্গিক নয় — গোষ্ঠী অধিকারের দাবি পেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন গ্রামের মৎস্যজীবীরা কোন অঞ্চলের বন সম্পদের ওপর দাবি জানাবেন বা সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা কিভাবে তা গ্রহণ করবেন তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। একই অঞ্চলের বন সম্পদের ওপর একাধিক গ্রামসভার মৎস্যজীবীদের দাবি থাকলে তার নিষ্পত্তি কিভাবে হবে, তাও স্পষ্ট হওয়া দরকার। গ্রামসভাগুলির সমন্বয়ের পদ্ধতি কিভাবে হবে, তা নিয়েও রাজ্যস্তরে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এই জটিলতা আছে বলে সুন্দরবনের চিরাচরিত বনজীবীরা বনাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন না। বনাধিকার আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়াটা তো শুরু হওয়া দরকার। প্রক্রিয়াটা শুরু হলেই একমাত্র এইসব জটিলতার অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু ভারতের, এমনকি পৃথিবীর এই গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলে বনাধিকার কার্যকর করার প্রক্রিয়াটাই বন্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা দুটিকে এই আইনের আওতার বাইরে রেখে।

নাগরিক মঞ্চ এর উদ্যোগ
আইনি সহায়তা কেন্দ্র
প্রতি মঙ্গলবার ২ - ৬ টা
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,কলকাতা - ৮৫,
ফোনে যোগাযোগ - ২৩৭৩১৯২১
(সোম থেকে শুক্র ৩ - ৭ টা)

জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন

উন্নয়নের নামে নির্বিচারে জলাভূমি ধ্বংস করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে মানুষ নিজেদের সভ্যতাকে এক গভীর সংকটের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই তো আজ পরিবেশ বিজ্ঞানী সহ অনেকেই দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বলছেন, জলাভূমি ভরাট আর এক ইঞ্চিও নয়।পাটুলী জলাভূমি বাঁচাও মঞ্চ ও এন.এ.পি.এম-এর উদ্যোগে জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন চলছে।

নিউ গড়িয়া - দমদম এয়ারপোর্ট মেট্রোরেল সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত বিকল্প পথ থাকা সত্ত্বেও পাটুলির প্রায় ১ কিমি বিস্তৃত জলাশয়কে ধ্বংস করে মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই যে কর্মোদ্যোগ তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

২০১২ সালে এ বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় (ডব্লু পি নম্বর - ৮৫৬৭ ডব্লু, ২০১২) এবং হাইকোর্ট এ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের হাই পাওয়ার কমিটিকে নির্দেশ দেন এবং সেই কমিটি প্রথমে তার ২৬.০২.২০১৩-র আদেশনামায় মেট্রো কর্তৃপক্ষকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেন - "to choose any alternative route without disturbing the ecological balance of the Baishnabghata-Patuli Township area up to water body can be considered for the interest of the environment and the common people."

পরবর্তিতে অত্যন্ত বিস্ময় এবং পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে, মেট্রো কর্তৃপক্ষের একতরফা আবেদনক্রমে অভিযোগকারীকে আদৌ কোনও শুনানির সুযোগ না দিয়ে ওই কমিটি ০৩.০৫.২০১৩ তারিখে এক নতুন আদেশে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ওই জলাভূমির মধ্য দিয়েই রেল লাইন পাতার অনুমতি দিয়েছেন।

মঞ্চের উদ্যোগ

সবার জন্য স্বাস্থ্য

কালধ্বনি পত্রিকা, ভূমধ্যসাগর পত্রিকা, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, নাগরিক মঞ্চ ও কিছু ব্যক্তি মানুষের উদ্যোগে সবার জন্য স্বাস্থ্য শিবির হয়ে গেল ২ মার্চ ২০১৪, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন হলে। সারা দিনের আলোচনা সভা দুটি পর্বে চলে। সভার প্রথম পর্বের সভাপতিত্ব করেন কালধ্বনি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী প্রশান্ত চ্যাটার্জী। দ্বিতীয় পর্বের সভাপতি ছিলেন ভূমধ্যসাগর পত্রিকার সম্পাদক জয়া মিত্র।

প্রথম পর্বের বিষয় ছিল 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা। বক্তা ছিলেন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের পক্ষে ডাক্তার পুণ্যব্রত গুণ ও ডাক্তার সিদ্ধার্থ গুপ্ত। ডা. পূণ্যব্রত গুণ তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকার বা রাষ্ট্র চাইলেই সরকারি ব্যবস্থায় সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। তিনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ তুলে ধরে এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ডাক্তার রেড্ডি কমিশনের প্রস্তাব সরকার সদিচ্ছা থাকলেই লাগু করতে পারত। স্বাস্থ্য খাতে সামান্য বাজেট বাড়ালেই সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা যায়।

ডাক্তার সিদ্ধার্থ গুপ্ত বলেন, বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই তথ্য সাধারণের নাগালের বাইরে। অধিকারগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সাধারণ মানুষের জানা নেই। সরকারি উদ্যোগহীনতা তার আর একটা কারণ। ফলত মানুষ তার সুফল পাচ্ছেন না। সামাজিক সংগঠনের কাজ এই সুযোগগুলো মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। এ ব্যাপারে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ ও পরিবেশনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারি প্রাইভেট পাবলিক মডেলে শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুরক্ষিত থাকছে না। শ্রমজীবী মানুষ অকারণে ব্যয়বহুল পরিষেবা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি দাবি তোলেন পাবলিক মডেলে সি জি এইচ এস-এর সমমান চালু করা হোক।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় বিভিন্ন জেলা থেকে আসা স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী, বিজ্ঞান কর্মী ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করেন। বাসন্তী ব্লকের পম্পা, ড. অনুপম পাল, কুলপীর প্রবীর সরকার, পুরুলিয়ার সুব্রত চক্রবর্তী, চাকদার বিবর্তন ভট্টাচার্য, পাথরপ্রতিমার বৃন্দাবন হালদার, আসানসোলের সুদীপা পাল, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের মহ. হাবিব, সুন্দরবনের দয়াবানপুরের মুকুন্দ গায়েন মেডিক্যাল ছাত্র প্রতিনিধি জীৎ সরকার, নাগরিক মঞ্চের পবন মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য, বাগনান এর অনিকেশ মন্ডল ও শিস্ সংগঠনের সাবিত্রীদি সবার বক্তব্যেই বেহাল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে গ্রামীন প্রান্তিক অঞ্চলের বেহাল দুর্দশার কথা ফুটে ওঠে।

পরিশেষে ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত বলেন উপস্থিত বক্তাদের প্রত্যেকটি দাবি বা অভিমত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন দাবি গুলোকে নিয়ে আগামী দিনে কাজে হাত দেওয়া দরকার। তিনি আরও উল্লেখ করেন বছরে ১ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাচ্ছেন কেবলমাত্র ব্যয়বহুল চিকিৎসার চাপে পড়ে। শোভন পন্ডা উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন আজকের এই সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি/সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা ও তাদের চিন্তাগুলো আমাদের বড় পাওনা। এই চিন্তাগুলোকে সুসংহত করে ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

এই সভা থেকে ঠিক হয় -

(১) ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালনের কর্মসূচি নেওয়া, স্বাস্থ্যের অধিকার, চিকিৎসার অধিকারের ওপর পোস্টার, লিফলেট ছাপানো ও প্রচার করা হবে;

(২) হাসপাতালে ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়ার সরকারি আদেশের প্রচার করা হবে।

বনাধিকার আইন কার্যকর করা হোক

স্টেট লেভেল কনসালটেশন অফ ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট - ২০০৬-এর ওপর দু'দিনের এক আলোচনা সভা হয়ে গেল কলকাতার সেবা কেন্দ্রে ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪। উদ্যোক্তা এইচ আর এল এন ও নাগরিক মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা দু'দিন ধরে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের ওপর তাদের স্ব স্ব মত ব্যক্ত করেন। দু'দিনের আলোচনায় যে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে —

- দার্জিলিং জেলায় ৬৪টি গ্রাম আছে সেখানে এখনো এফ আর এ সম্পূর্ণভাবে লাগু হয় নি।
- রাজাভাতখাওয়ার প্রতিনিধি সুন্দর লামা বলেন জমির পাট্টা দেবার বিষয়টা গভীর চর্চার বিষয়। এফ আর এ লাগু করতে ধারাবাহিক আন্দোলনে থাকতে হবে।
- সুন্দরবন থেকে আসা প্রতিনিধি শ্রী গোবিন্দ দাস বলেন সীমাহীন অত্যাচার চলছে সুন্দরবনের দ্বীপগুলোতে। এফ আর এ সম্পর্কে সুন্দরবনের মানুষ ২০১০ সালের পর কিছু কিছু জানতে পারে। ২০১১-১২ সালে এফ আর এ চালু করার জন্য 'বোট প্রচারের' উদ্যোগ নেওয়া হয়। দিনকে দিন সুন্দরবনের কোর এলাকা বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে কোর এলাকা

(শেষাংশ ১৫ পাতায়)

নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সবুজ মঞ্চের পরিবেশগত দাবি সনদ

বিভিন্ন সংস্থা ও সাধারণ মানুষের পরিবেশ সংক্রান্ত দাবিদাওয়া, মতামত আর আলোচনার জায়গা হল সবুজ মঞ্চ। সবুজ মঞ্চের জন্ম ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে। তখন দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার আর প্রচারের সময় পরিবেশগত সমস্যাগুলো সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছে। অথচ বর্তমান যুগে পরিবেশের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়াই হল সবুজ মঞ্চের উদ্দেশ্য। সবুজ মঞ্চের মতে, পরিবেশ সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলের উদাসীনতা এতটাই গভীর যে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা পরিবেশের ব্যাপারগুলো একেবারেই আমল দেবে না।

জন্মের পর পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। আরও একটা সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্তেহার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, আগের তুলনায় পরিবেশের উল্লেখ কিছুটা বেশি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো মুখের কথার বেশি কিছুই নয়। নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কোনও উল্লেখ নেই। অনেক কথাই ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, পরস্পর বিরোধী আর অস্বচ্ছ। যে সব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আছে তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয়। এমন কী, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকরও। পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে আর সবুজ মঞ্চের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা নতুন সরকারের কাছে দাবিদাওয়ার এক তালিকা পেশ করেছি। আমাদের ধারণা দাবিগুলো মেটানো খুব কঠিন নয়।

১. পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

ক)স্থানীয় গোষ্ঠী / নাগরিক সমাজের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার দেওয়া। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যাঁদের হাতে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাঁরা আইনত জবাব দিতে বাধ্য হবেন। 'যৌথ পরিবেশ রক্ষা ব্যবস্থা'র মডেল অনুসরণ করা দরকার। এ জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, কাজে লাগানো আর নজরদারির ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে একযোগে স্থানীয় গোষ্ঠী আর নাগরিক সমাজের কাজ করা জরুরি। পরিকল্পনার সময় সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

খ)পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা থাকা দরকার। প্রতিটি সিদ্ধান্তে দীর্ঘমেয়াদ আর ভারসাম্যের বিষয়গুলো অন্তর্নিহিত থাকা উচিৎ। এ কথাও মনে রাখা দরকার *যে প্রযুক্তি সত্ত্বেও সব সময় বা সব জায়গায় উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়।* পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপারে আইন বহির্ভূত কাজকর্মের অভিযোগ শোনা যায়। সেই কারণে সংসদীয় কর্মপদ্ধতি অনুসারে ছাড়পত্র দেওয়ার পদ্ধতিও ভিডিও করা দরকার।

গ)দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ — এই সংস্থাটি কাগজে কলমে স্বাধীন হলেও অনেক সময় সরকারি হস্তক্ষেপের শিকার। একে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নির্বাচনী কমিশনের মতো একে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। যে সব সংস্থা পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে পর্ষদের। পর্ষদের কাজে কোনও গোপনীয়তা থাকবে না আর এখানে সাধারণ নাগরিকের মতামতও গুরুত্ব পাবে।

২. জল

ক) শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের প্রতি নজর রেখে জলের সদ্ব্যবহার, ব্যবহৃত বা নোংরা জল পরিশোধন করে তা ফের ব্যবহার আইনত বাধ্যতামূলক করা হোক। জল নিয়ে জোরদার সচেতনতা আন্দোলন আর আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধার সাহায্যে গৃহস্থলের জল নষ্ট বন্ধ করতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

খ) দূষণ, দখল আর পরিবেশ পরিবর্তনের মতো মানুষের তৈরি নানান কারণে আজ গঙ্গার মতো অনেক নদনদীর অবস্থা শোচনীয়। আমাদের দাবি, সারা দেশে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নদী নীতি চালু হোক। যে গঙ্গার ওপর বিশ্বর আট শতাংশের বেশি মানুষ নির্ভরশীল, সেই গঙ্গার জন্যে নীতিতে আলাদা জায়গা রাখা হোক। নদী সংরক্ষণের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে দায়িত্বপূরণে ব্যর্থতার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা করা হোক।

এই প্রসঙ্গে দেশের নদীগুলো জুড়ে দেওয়ার (আই এল আর) বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার বিষয়টি মোকাবিলা করতে যথাযথ আর সীমিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) উপকূলবর্তী এলাকা ও মৎস্যশিল্প — পরিবেশ বদলের ফলে দেশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলো বিপন্ন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের নানান জায়গায় আইনকে কলা দেখিয়ে এ সব অঞ্চলে অবাধে ব্যবসা হয়ে চলেছে। ফলে এলাকার বসবাসকারীদের টিঁকে থাকা মুসকিল হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরার ফলে, সাবেকি উপায়ে মাছধরার রীতিগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এই অবস্থা অবিলম্বে মূল্যায়ন করে যথাযথ আইন প্রণয়নের দাবি জানানো হচ্ছে।

ঘ) পুকুর, দীঘি আর জলাজমি — উন্নয়নের নামে এ সব নিয়মিত ভরাট হয়ে চলেছে। এটি অবিলম্বে বন্দ করে জলাশয়গুলো মুক্ত করার দাবি জানান হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের উদাহরণ অনুসরণ করে এক এক রাজনৈতিক নেতাকে এক একটি জলাজমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

৩. বায়ু দূষণ

শিল্প, যানবাহন ও অন্যান্য সূত্র থেকে বায়ু দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করলেও নির্বাচনী ইস্তেহারগুলিতে এর কোনও উল্লেখ নেই। আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও দূষণ রোধ আইন কার্যকর হয় না। প্রথম সারির কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা জানিয়েছে, দূষণ-জনিত মৃত্যুর মধ্যে বায়ুদূষণের অবদানই বেশি। বায়ু দূষণের ফলে ক্যানসারও হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বায়ু দূষণ রোধ করেতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৪. হিমালয় নীতি

নানাভাবে হিমালয়ের ওপর অত্যাচার তুঙ্গে উঠেছে। গঙ্গার মতো এই পাহাড়শৃঙ্খল দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আঞ্চলিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে সামনে রেকে অবিলম্বে হিমালয় নীতি চালু করার দাবি জানানো হচ্ছে।

৫. বনজঙ্গল

অরণ্য আইন যথাযথ প্রণয়ন করে বন্যপ্রাণী আর জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল মানুষের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, বেআইনিভাবে অনেক জঙ্গলের বড় বড় অংশ বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে নিরপেক্ষ উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। দোষী রাজনৈতিক নেতা আমলা ও অন্যান্য পদাধিকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকার দরকার।

৬. শব্দ

শুধু শহরে নয়, মফঃস্বল আর গ্রামেগঞ্জে, বিশেষ করে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় অতিরিক্ত শব্দ দূষণ বড় ধরনের পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করেছে। এই ধারা বন্ধ করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি দাবি হল, আপাতত পশ্চিমবাংলায় বাজি সংক্রান্ত যে আইন, মানে, পাঁচ মিটার দূর পর্যন্ত ৯০ ডেসিবেলের বেশি শব্দ হবে না, সেই আইনকে আরও কড়া করা হোক। জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অন্যান্য বিষয় মাথায় রেখে ডেসিবেলের মাত্রা আরও কমানো হোক আর সারা দেশে এই আইন কার্যকর হোক।

৭. শক্তি

বিকল্প শক্তির ব্যবহার নিয়ে জোরদার প্রচার চালানো অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ আর আর্থিক অনুদান প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ আর সাহস জোগাতে সরকারি সংস্থাগুলোর উচিৎ বিকল্প শক্তি ব্যবহার করে পথ দেখানো।
পরমাণু শক্তি ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করছি আমরা।

৮. নতুন জমানার দূষণ

নতুন প্রযুক্তি, মানে মোবাইল টাওয়ার আর কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে যে নতুন ধরনের দূষণ হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিষদ আর বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা করার পরে আইন প্রণয়ন করা দরকার।

৯. জি এম খাবার

দেশে জেনেটিক মডিফায়েড (জি এম) খাবার চালু করার ব্যাপারে আমাদের ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। (সবজির কোষে কারিকুরি করে ফলন আর আকার বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে জি এম বলা হয়।) এ জাতীয় খাবার থেকে নানারকম ক্ষতি হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হওয়ার আগে জি এম খাবার চালু হলে দেশের মৌলিক খাদ্যের সুরক্ষা ব্যাহত হবে।

১০. পরিবেশ বদল

এলাকা ও নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক জি এইচ জি (গ্রিন হাউস গ্যাস) কতটা বেরচ্ছে তা বিচার করে সেই গ্যাস কমানো আর বদলানোর জন্যে দেশের মধ্যে নীতি কাজে লাগাতে হবে। অন্যান্য সমমনোভাব আছে এমন দেশের সঙ্গে একযোগে সমতা ভিত্তিক পরিবেশ বদল নীতি জোরের সঙ্গে অনুসরণ করা জরুরি।

১১. গ্রামীণ পরিবেশ

বেশির ভাগ সময় শহরাঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যার ওপরে জোর দিয়ে গ্রামাঞ্চলের পরিবেশের কথা উপেক্ষা করা হয়।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের অভাবে শিল্প থেকে দূষণ, শৌচ ব্যবস্থার অভাবের মতো বিভিন্ন কারণে গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আমাদের দাবি গ্রামাঞ্চলের পরিবেশের প্রতি অবিলম্বে নজর দেওয়া হোক। নজরদারি আর আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে দেওয়া যেতে পারে।

১২. গাছপালা

শহরাঞ্চলের কথা মাথায় রেখে, ন্যূনতম গাছপালা আইন চালু হওয়া দরকার। প্রতিটি এলাকায় অন্তত কিছু গাছপালা (তা ১০% ভাগ হতে পারে) যেন থাকে তা নিশ্চিত করা জরুরি। যে সব এলাকায় তা নেই, সেখানে আগাম ক্ষতিপূরণ ছাড়া বাড়িঘর তৈরি করা নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক বিপদ

শিল্পে কাজ করতে গিয়ে দূষণের ফলে শারীরিক ক্ষতি বা মৃত্যু হলে, শ্রমিকের চিকিৎসা বা মৃতের পরিবারের ভার সরকার বা দায়িত্বশীল কোনও সংগঠনকে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

১৪. শৌচাগার, জল নিকাশি ব্যবস্থা (স্যানিটেশন)

স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও দেশের বহু জায়গায় এখনও এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়নি। এ কথা গ্রামের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি শহরের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে। এমন কি, অনেক সময় স্কুলে ঠিকমতো বাথরুমের অভাবে বাচ্চাদের অসুখ করে আর স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দাবি, অবিলম্বে এ দিকে নজর দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক।

১৫. জঞ্জাল

আরবান ডেভেলপমেন্ট বা শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা আর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে জঞ্জাল সাফের বিষয়টি আদৌ কোনও গুরুত্ব পায় না বলে আজ শহরে জঞ্জাল বড় ধরনের সমস্যার আকার নিয়েছে। জঞ্জাল থেকে পরিবেশগত সমস্যা বাড়ছে, বাড়ছে নানান অজানা অসুখের সংখ্যা। সুচিন্তিত পরিকল্পনা না থাকায় জলাজমিও ভরাট হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের দাবি, এই ধারার মুখ এখনই ঘোরানো হোক, শহরের উন্নয়নে 'আগে জঞ্জাল,পরে (শপিং) মল' নীতি চালু হোক।

১৬. খোলা মুখের খনি (ওপেন কাস্ট মাইন)

সারা দেশে এই ধরণের খনি বন্ধ করা হোক।

১৭. ফ্লাই অ্যাশ ইঁট

পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে লাল ইঁটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার বদলে, ফ্লাই অ্যাশের ইঁট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট পাশ করেছে। আশপাশের উর্বর জমিকে রক্ষা করা হল এই আইনের লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই আইন আর নির্দেশ নিয়মিত অমান্য করা হচ্ছে। দেশের উর্বর জমিকে রক্ষা করে ভবিষ্যতে দেশবাসীর খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের দাবি এই আইন অবিলম্বে বলবৎ হোক।

(১২ পাতার পর)

বনাধিকার আইন

১৭০০ বর্গ কিলোমিটার বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ফলত জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষ, মৎস্যচাষী, মধু সংগ্রহকারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মিথ্যা মামলায় মানুষকে গ্রেপ্তার করে ভীত-সন্ত্রস্ত করছে সুন্দরবনের প্রশাসন। তাপস মন্ডল বলেন সুন্দরবনে বিভিন্ন দ্বীপে আইনি শিবির অবিলম্বে চালু করা দরকার। তিনি দাবি তোলেন সুন্দরবনে একটি অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হোক ও গণশুনানির ব্যবস্থা করা হোক। তিনি মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারি ভাতা চালুর দাবী তোলেন।

- অমানুষিক অত্যাচার চলছে জঙ্গলের মানুষের উপর। কলু বাউরি, বাঁকুড়ার প্রতিনিধি বলেন বনাধিকার আইন-২০০৬ লাগু করার দাবীতে আন্দোলনে নামা হবে। জমির পাট্টা, পাট্টা দেওয়া জমির সম্পদকে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

- কার্সিয়াং জেলা থেকে আসা রাজকুমার বলেন, আর টি আই করে কার্সিয়াং জেলার জঙ্গলের প্রকৃত অবস্থান ও আয়তন জানা দরকার।

- দার্জিলিং জেলার নেসপন সংগঠনের স্বরূপ সাহা বলেন কমিউনিটি ফরেস্ট রাইটস্ (সি এফ আর)-এর মাধ্যমে বনজ সম্পদ সংগ্রহ হচ্ছে। গ্রাম সভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। গ্রাম সভার অনুমতি ছাড়া কেউ গ্রাম সভার আওতাধীন জঙ্গলে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না বলে বোর্ড লাগানো হয়েছে। তিনি বলেন গ্রাম সভার প্রত্যেক সদস্যের এফ আর এ আইন সম্পর্কে আরও ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

- এইচ আর এল এন সংগঠনের পক্ষে শ্রী দেবাশিস ব্যানার্জী বলেন, নাগরিক মঞ্চ এ বিষয়ে প্রচারের বিষয়টা দেখবেন।

সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

(১) নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে সই সংগ্রহ অভিযানের ব্যবস্থা করা হবে।

(২) 'বনের মানুষের সংগ্রাম' বুলেটিন তিন মাস অন্তর প্রকাশ করা হবে।

(৩) বাঁকুড়া ও সুন্দরবনে জনসচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে।

বিনামূল্যে ওষুধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছে, সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর হাসপাতালের বহির্বিভাগ আর জরুরী বিভাগে 'প্রয়োজনীয়' সব ওষুধ সবাইকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। চিকিৎসার জন্য যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁদেরও একটা বড় অংশ 'প্রয়োজনীয়' ওষুধ বিনামূল্যে পাবেন।

সরকারের এই ঘোষণা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হলে নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের সার্বজনীন অধিকারের দিকে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যা যে বহু মানুষের জীবনে একটা সামাজিক সঙ্কট হয়ে দেখা দিচ্ছে এটুকু দেখতে পাওয়ার জন্য তথ্য, পরিসংখ্যান কিছুই লাগে না। কিন্তু পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এই সঙ্কটের পিছনে ওষুধের ভূমিকা চোখে পড়ে। যেমন, আমাদের দেশে চিকিৎসা খরচের বড় অংশই (গড়ে ৬৭%) যায় আমাদের নিজেদের পকেট থেকে আর চিকিৎসাবাবদে এই খরচের সিংহভাগ (গড়ে ৭২%) যায় ওষুধের পিছনে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রমাগত রুগ্ন হওয়ার সাথে সাথে এই খরচের ভারও উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে চলেছে। ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৬-৮৭ সালে হাসপাতালে ৩২% ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়া যেত। ২০০৪ সালে এই অংশটা নেমে এসেছে ৯ শতাংশে!

এই বিপুল খরচের ভার বিশেষ করে অসহনীয় হয়ে উঠেছে দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে। আমাদের দেশের ১৫.৪% পরিবারের মোট খরচের ১০% -এর বেশি চলে যায় চিকিৎসার জন্য। আর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতো এই ধরনের চিকিৎসা খরচের ধাক্কায় প্রতি বছর আমাদের দেশে চার কোটি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাচ্ছে।

এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ঘোষণা সত্যি সত্যিই কার্যকরী হলে সেটা একটা পরিবর্তন সূচিত করবে। কিন্তু ঘোষণার ছ' মাস পরও সবাইকে বিনামূল্যে সব 'প্রয়োজনীয়' ওষুধ সরবরাহের কিছুমাত্র তোড়জোড় চোখে পড়ছে না। নাগরিক মঞ্চ সহ কিছু সামাজিক সংগঠন এবং পত্রিকা কিছুদিন ধরে 'সবার জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার' নিয়ে কথা বলা আর প্রচারের কাজ করছেন। ২ মার্চ ২০১৪ এই রকম একটা আলোচনায় উঠে এসেছে স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য নাগরিক উদ্যোগের কথা। আর তারপর ওষুধের ব্যাপারে সরকারি বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হচ্ছে কিনা খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে প্রাথমিক কাজটুকুও শুরু হয়নি এখনও।

প্রশাসন ব্যবস্থার এ জাতীয় গা-ছাড়া ঔদাসিন্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু নাগরিক সমাজেরও এই ঔদাসিন্য গা-সহা হয়ে গেলে সেটা উদ্বেগের কথা। স্বাস্থ্যের সার্বজনীন অধিকারের দিকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপের সম্ভাবনা অবহেলায়, ঔদাসিন্যে বা স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় যাতে নষ্ট না হয় সেটা নাগরিক সমাজকেই দেখতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের সাথে নাগরিক সমাজের কথা বলা শুরু করতে হবে। স্থানীয় আধিকারিকদের কাছে দাবি করতে হবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি যাতে বাস্তবায়িত হয়, যাতে ওষুধ না পেয়ে কাউকে সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ফিরতে না হয়। স্থানীয় আধিকারিকরা ব্যর্থ হলে কথা বলা যেতে পারে পরবর্তী উচ্চতর প্রশাসনিক স্তরে। আর এইভাবে গড়ে উঠতে পারে অধিকার অর্জনের জন্য দায়িত্বশীল এক নাগরিক উদ্যোগ।

মানস: মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষজন এবং তাদের পরিবার নিয়ে গড়া একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

'মানস' -এর সূচনা ১৯৮১ সালে, কলকাতার পার্ক সার্কাসের 'মডার্ন স্কুল ফর বয়েজ'-এ।

দশ বছর বাদে ১৯৯২ সালে নদিয়া জেলার মদনপুরে তেঘরি গ্রামে বহু মানুষের সাহায্য, সহযোগিতা আর দানে 'মানস'-এর গ্রামীন কাজকর্মের সূচনা হয়।

মানস-এ সপ্তাহে দু'দিন চলে মানসিক রোগের বহির্চিকিৎসা। আছে মানসিক রোগীদের আবাসিক পুনর্বাসন কেন্দ্র 'ক্ষণিকা'। এছাড়া মাসের প্রথম মঙ্গলবার চলে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। মাসে একদিন চলে বয়স্ক মানুষদের বিশেষ মানসিক সহায়তা দানের শিবির।

নার্সিং ও অন্যান্য ট্রেনিং, চাষবাস, হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প, বাৎসরিক মেলা এই সবের সঙ্গে যুক্ত এখন 'মানস'।

এর পাশাপাশি আরো একটি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হল। স্বাভাবিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের জন্যে প্রতি শনিবার একটি ক্লিনিক চালু হয়েছে অটিস্টিক, সেরিব্রাল পালসি, অল্পবুদ্ধিসহ শিশুদের অন্যান্য রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসার জন্য। এই ক্লিনিকে পরিবারের মা-বাবা ও নিকট সদস্যদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে — তাঁরা কীভাবে এই ধরনের শিশুদের দেখাশোনা করবেন এবং এই ধরনের শিশুদের জীবনচর্চার জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা করবেন — এইসব নিয়ে।

১লা মে, ২০১৪, বৃহস্পতিবার মানস-এ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ক্লিনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল।

যোগাযোগ - সম্পাদক, মানস 9831318265

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে দীপঙ্কর বসু ও স্বাতী গুপ্ত কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম ৭, কলকাতা - ৮৫ থেকে প্রকাশিত
ফোন : ২৩৭৩ ১৯২১, ৯৮৩০২৭১০৮১
এবং প্রিন্ট ডট কম, ই-৬/৯ পূর্ব্বাশা হাউজিং এস্টেট, ১৬০ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা - ৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৯৮৩০৩৫৯৭২২
বিনিময় মূল্য : আট টাকা